আমাকে আমি হতে শেখাও

মূলঃ নগুগি ওয়াথিয়োঙ্গ'ও

অনুবাদঃ এলহাম হোসেন

[নগুগি ওয়াথিয়োঙ্গ'ও কেনিয়ার কণ্ঠস্বর, বাইরের বিশ্বে কেনিয়ার ভাষা, সংস্কৃতি ও চেতনার দূত। ইতিহাস ও রাজনীতি-সচেতন মার্কসবাদী লেখক হিসেবে তাঁর পরিচিতি বিশ্বজুড়ে। লেখেন স্থানীয় গিকুয়ু ভাষায়। ইংরেজিতেও। তাঁর নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সারা বিশ্বের পাঠকের কাছে এক অজড় ও পরাক্রমশালী প্রপঞ্চ। নিচের অনুবাদকৃত বক্তৃতাটি তিনি ২০১৫ সালের জুন মাসে কেনিয়ার কেনিয়াত্তা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব নাইরোবিতে প্রদান করেন।] অনুবাদক

১৯৬৯ সাল। নাইরোবী থেকে একশ মাইল দূরের শহর নাইয়েরীতে গাকাম্বা নামে কে দ্বিচক্রযান মেরামতকারী এক ধরনের ইঞ্জিন আবিষ্কার করে। একটা স্কুটার ইঞ্জিন। বাড়ির পেছনের আঙ্গিনা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কিছু ধাতব পাত দিয়ে একটা উড়োজাহাজ তৈরী করে ফেলল। নাম দিল কেনিয়া ওয়ান। উড়োজাহাজটা কয়েক মাইল উড়লো। কিন্তু নামার সময় একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হলো। সম্প্রতি সময়ের স্বাধীন রাষ্ট্র কেনিয়ার তৎকালীন এটর্নী জেনারেল চার্লস নজোন্‌জো বিমান সংস্থার লাইসেন্স ছাড়া গাকাম্বার উড্ডয়নের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। তার এই আদিম উড়োজাহাজ ইউরোপে তৈরী উড়োজাহাজ চালনার কাঙ্খিত মান নিশ্চয় রক্ষা করতে পারেনি।

এই গল্পের দুই লোকের তাদের নিজ দেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীকী অর্থের চাইতে নজোনজো যে গাকাম্বাকে থামালো সে ব্যাপারে আমি অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহী । গাকাম্বা সম্ভবত মাধ্যমিক স্কুলের গন্ডি পেরোয় নি। কিন্তু নজোনজো স্নাতক করেছেন দক্ষিণ অফ্রিকার ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডনের লিংকন্‌স ইন থেকে, যা তাঁকে ব্রিটিশ-ব্যরিষ্টার এবং তাঁর সময়ের অন্যতম উচ্চশিক্ষিত কেনীয় বানিয়েছে।

নজোনজো এত ভালো ইংরেজি জানতেন যে, তিনি, আমরা যেমন বলে থাকি, ইউরোপের বাসিন্দাদের মতো নাকিসুরেও ইংরেজি বলেন। অপরপক্ষে, গাকাম্বা ইংরেজিতে স্বতস্ফূর্ত নয়, কিন্তু সম্ভবত গিকুযুতে বেশ স্বতস্ফূর্ত। ব্যাপারটা হলো যে, যখন গিকুয়ুভাষী কর্মকার গাকাম্বা, হিপহপ শিল্পী জুয়া কালি অথবা রাস্তার পাশের কোন শিল্পী বলে যে, সে কেনিয়ায় উড়োজাহাজ তৈরী করতে পারে এবং একটা তৈরী করে তা প্রমাণ-ও করে, তখন শিক্ষিত এটর্নী বলেন, আমরা পারি না। গাকাম্বা তার স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল, আর নজোজো অন্যের দেখা স্বপ্নের গৌরব-গাঁথা গায়। গাকাম্বা চেয়েছিল অসম্ভব থেকে সম্ভবকে বের করে আনতে। সঠিক ব্রিটিশ উচ্চারণের শিক্ষিত কেনিয়ানরা বলেন, "একদম চেষ্টাটা পর্যন্ত করবে না। "

এখানেই কেনিয়ার সংঘর্ষপূর্ণ দুই রকমের দর্শন ছিল: গাকাম্বার দর্শন বলে যে, আফ্রিকা তৈরী করতে পারে। নজোন্‌জো বলেন, "ওটা ইউরোপের হাতে ছেড়ে দাও। " সক্ষম কেনিয়র পরিবর্তে ভ্রমণে অভিজ্ঞ কেনীয় কাঁচা মাথার লোককে সাহায্য করে যে কখনও কোনিয়ার বাইরে যায় নি। অথচ নজোনজো গাকাম্বার স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। আর ফলাফল, তা ইচ্ছাকৃতই হোক আর অনিচ্ছাকৃতই হোক, সাধারণ কেনীয়দের আদর্শ ও দর্শন হিসেবে গাকাম্বার আবিষ্কার আর এগুতে পারে নি।

গাকাম্বার চেষ্টা ও পরিণতি যা সে বরণ করে, তা ৬০ এর দশকের আর একটি গল্প আমাকে মনে করিয়ে দেয়। আর এটা ছিল ১৯৬৭ সাল। আমি ১৯৬৯ সালে নাইরোবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেই। স্পেন্সার থেকে স্পেন্ডার বা শেক্সপীয়র থেকে টি. এস. এলিয়ট পর্যন্ত ইংরেজদের জাতীয় সাতিহ্য আমাদের পাঠ্যক্রমের একেবারে কেন্দ্র

দখল করে ছিল। কেন ইংরেজদের জাতীয়-সাহিত্য কেনিয়া, ওউর আনিউম্বা, তামান লো লিয়ং-এর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যক্রমের কেন্দ্র দখল কওে থাকবে। এটিই আমার জিজ্ঞাসা। আমরা ইংরেজি বিভাগ উচ্ছেদের আহবান জানাই।

বাস্তবে আমরা ইংরেজি সাহিত্য উচ্ছেদের আহবান জানাই নি; বরং আমাদের বাস্তবতার সাথে এর নতুন করে শৃংখলা তৈরীর কথা বলেছি। আমরা কি ওখান থেকে শুরু করে এখানে আসব – এটি একটি ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া, নিজেকে অস্বীকার করার প্রক্রিয়া। না-কি এখান থেকে ওখানে যাব – ঔপনিবেশিকতা বিরোধী, আত্ম-স্বীকৃতিমূলক ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া।

আমরা কেনিয়াকে আমাদের সাহিত্যের ভিত্তিভূমি বানাতে চেয়েছি যেখান থেকে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠবে। আমরা কেনীয়, পূর্ব আফ্রিকী, আফ্রিকী, ক্যারিবীয় ও অ্যাফ্রো-আমেরিকী সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে ইংরেজি বিভাগকে হটিয়ে দিতে চাই। তারপর এশীয়, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপীয় সাহিত্যকে ক্রমানুযায়ী সাজাতে চাই। সে-সময় ইংরেজি বিভাগ সাহিত্যকে ইংরেজি ভাষার মধ্যে আটকে রাখতে চাইত। আমরা চেয়েছিলাম ইংরেজি ভাষার কারাগার থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করতে এবং বাকি বিশ্বের সাথে যুক্ত করতে। নাইরোবীর এই বিতর্কের পেছনে পেছনে আফ্রিকায় আর একটা বিতর্কের জন্ম হলো, যা এখন উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব নামে পরিচিত।

আমাদের বিভাগ যে সব ছাত্রদের তৈরী করেছে তারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হয়েছে। সিমন গিকান্দি এখন প্রিন্স্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক। জেম্স ওগুদি এখন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় অধ্যাপক্ আর গিতাহি গিতিতি এখন রোদ দ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যাঁরা বহি:বিশ্বে নাম কামিয়েছেন এগুলো তাঁদের মধ্যেকার গুটিকয়েকের নাম । কিন্তু দেশের মধ্যে আরও অনেকে আছেন: হেনরী চাকাভা, ক্রিস ওয়ানজালা, ওয়ানজিকু মুবাকি, কিমানি নজোগু। তাঁদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা তাদের কেনীয় ভিত্তির মধ্যে গভীরভাবে থোথিত।

১৯৭৪ সালে আমাদের আজকের বিখ্যাত সাহিত্যবিভাগ আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্য পড়ানোর উদ্যোগ নেয় যার মনেযোগের প্রথম কেন্দ্র ছিল কেনিয়া, অতপর আফ্রিকা, আর সবিশেষে বাকি বিশ্ব । এর অর্থ ছিল যে, যে শিশুটা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হচ্ছে সেও কেনিয়ার সাহিত্য গ্রন্থ ও এশিয়া ও ইউরোপের সাথে সেগুলোর সংশ্লিষ্টতার জ্ঞান অর্জন করবে। এভাবে এটা বৈশ্বিক সাহিত্য-নাগরিক তৈরী করবে যাদের পা শক্তভাবে প্রোথিত থাকবে কেনিয়ার মাটিতে। কিন্তু মই-এর রাজত্বকাল পাঠ্যক্রমকে ধ্বংস করে দেয় সহজেই সাহিত্যের পাঠ্যক্রমকে বাদ দিয়ে। এই রাজত্বের ধারণায়, ইংরেজি ভাষাকে বিশ্বসাহিত্যের দ্বারা দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হয়েছিল যা কেনিয়াতেই শুরু হয়। প্রয়োজনীয় সব উপায়ে ইংরেজি ভাষার খাঁচা ভাঙ্গতে হবে যাতে কেনিয়ার সকল সাংস্কৃতিক বন্দী স্বাধীন হয়।

সাহিত্যের পাঠ্যক্রম ধ্বংস করাই কারারক্ষীদের ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। কামিরিথুর গল্পও আছে। যেহেতু আমি ইতোমধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক লিখেছি তাই এখন সংক্ষেপে বলি। কামিরিথুর উদ্যোগে নাইরোবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীরা কৃষক শ্রমিক, ভূমিহীন, বেকার লোকদের হাতে হাত রেখে *নাগাহিকা নাদিন্দার* (*যখন খুশি তখন বিয়ে করব*) এক অসাধারণ উপস্থাপনা করে।

সম্ভবতঃ ঔপনিবেশোত্তর কেনিয়ায় নাইরোবী থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরের কামিরিথু গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য পিকুয়ু ভাষায় এটিই প্রথম নাটক। এর পশ্চাতের মূল ধারণাটি ছিল খুবই সাধারণ। যদি আপনি মনে করেন যে, মানুষই হলো উন্নয়নের কর্তা ও কর্ম, তবে তাদের নিয়ে, তাদের কথ্য ও ব্যবহার্য ভাষা নিয়ে আপনি কাজ করবেন। সাহিত্যের পাঠ্যক্রমের মতই ভাগ্য বরবার প্রাক্কালে এই নাটকটি শত শত গ্রামবাসীর সামনে প্রদর্শিত হয়। ১৯৭৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর আমাকে ও আমার সহ-লেখকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় এক বছরের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়।

কামিরিথুর লোকেরা বলল, আফ্রিকী ভাষাতেই আমাদের শুরু। আর যারা আমাকে জেলে পুরলো, তারা বললো, ইংরেজি ভাষা-ই তাদের শুরু।

এবার আসা যা'ক গাকাম্বার গল্পে। এই গল্পগুলোর প্রত্যেকটাতে বাহির থেকে আসা জাতীয় উদ্যোগের প্রতি আমাদের অস্বীকৃতি রয়েছে। কেনিয়ার মাটি থেকে যা আসে তার প্রতি আছে সন্দেহ। আর যা বিদেশ বা বিশেষকরে ইউরোপ থেকে আসে, তাকে সমালোচনার উর্ধ্বে থেকে স্বাগত জানানো হয়।

এটি কি দুর্ঘটনা ?

এই প্রশ্নটিই আমকে চতুর্থ গল্পে নিয়ে আসে। এটি ঘটেছিল ঔপনিবেশিক আমলে। এতে এক কেনিয় জড়িত - নাম হলো মবিয়ু কোয়েনেঞ্জ যে কেনিয়ার অ্যালায়েন্স হাইস্কুলে পড়াশুনা করে। তারপর আমেরিকার ভার্জিনিয়া হ্যাম্পটন ইনস্টিটিউটে। অবশেখে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করেন আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সে কেনিয়ায় ফিরে আসে ১৯৩৮ সালে। তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে এতটাই গর্ববোধ করলেন যে, তাঁর জন্য একটা পাথরের বাড়ি তৈরী করে দিতে চাইলেন। ছেলেটি তাঁর বাবাকে প্রস্তাব দেন, চলুন, গিথুংগারি টিচার্স কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এই পাথরগুলো কাজে লাগাই। ঔপনিবেশিক কেনিয়ায় উচ্চ শিক্ষার জন্য এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোয়েনেঞ্জের স্বপ্নাবিভাব উৎসাহিত হয়েছিল আত্মনির্ভরশীলতার দৃকশক্তি থেকে যার স্বপক্ষে ছিলেন বুকার টি. ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটন নিজেই ভার্জিনিয়া হ্যাম্পটন ইন্সটিটিউট থেকে স্নাতক করেন এবং তুসকিজি ইনসটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সামাজিক অন্তদৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ আছে কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি সমীহ অর্জন করেছে এবং কোয়েনেঞ্জকে উৎসাহিত করেছে। গিথুংগারী নির্মিত হয়েছে কেনিয়ার সাধারণ নারী পুরুষের দ্বারা, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দ্বারা নয়।

কলেজটির রূপরেখা তৈরী করা হয়েছিল আফ্রিকীদের দ্বারা পরিচালিত নির্ভরতামুক্ত স্কুলগুলোর শিক্ষক তৈরীর নিমিত্ত। কারিংগা এবং নির্ভরতামুক্ত স্কুলের জন্য আন্দোলন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল গারভেতির আত্মনির্ভরশীরতার শ্লোগান ও আহবানের দ্বারা (যা ওয়াশিংটন থেকে আগত) "আফিকীদের জন্য আফ্রিকা, দেশ ও দেশের বাইরে।" যখনই এই স্কুলগুলোর কোন একটার কমিটির সদস্যগণ সাক্ষাত করত তখনই তাদের প্রথম কাজই ছিল যে, পকেট থেকে সাধ্যমত কিছু বের করে টেবিলে রেখে এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া। গিথুংগারীও একই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ নারী-পুরুষদের যে যা পেরেছে তা কম হোক আর বেশী হোক- তাই দিয়েই অংশগ্রহণ করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, গিথুংগারী ও সমগ্র নির্ভরতামুক্ত স্কুল আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতারা সে-ই স্বপ্ন দেখার সাহস দেখিয়েছিল যা আগে কেউ পারে নি। কেনীয়রা বলল, আমরা কেনীয়রা এটা করতে পারি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলল, আমরা তোমাদের এটা করতে দেব না।

১৯৫২ সালে রাষ্ট্র পিথুংগারী আর অন্যসব স্বাধীন স্কুলগুলো বন্ধ করে দেয়। আফ্রিকী ভাষার সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়; সম্পাদকদের জেলে পাঠায়; কাউকে কাউকে নির্বাসনে যেতেও বাধ্য করা হয়। আফ্রিকী ভাষার কবি গাকারা ওয়া ওয়ানজাও আর স্ট্যানলি কাগিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বন্দী শিবিরে আটকে রাখা হয়। এটা কি জানা-কথা? কিন্তু অবমাননার চরম চিত্র হলো — ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গিথুংগারীকে কারাগারে পরিণত করে, যেখানে এই দেশ ও স্বাধীনতার সৈনিকদেরও মাও মাও নামকরণ করা হয় ও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। কেনীয়-আফ্রিকী আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীককে এভাবে লজ্জা, অপমান পরাজয়ের গ্লানিতে পর্যবসিত করা হয়।

কেনিয়া ভিত্তিক আফ্রিকা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ইংরেজি ভাষা-ভাষী অভিজাত শ্রেণীর উত্থান ঘটে; তারা কিন্তু আফ্রিকী ভাষাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন। আর এভাবেই ১৯৪২ সালের পরে ব্যাপারটা এমন দাড়ালো যে, কেউ গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা ইতিহাসে যতই মেধাবী হোক না কেন– ইংরেজি ভাষায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও ইংরেজিতে পাশ করা ব্যতিরেকে কাউকে পরের ক্লাসে উঠতে দেওয়া হতো না। ১৯৬৪ সালে নব্য স্বাধীন কেনিয়ার সরকার অমিন্ডি কমিশন গঠন করে এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে জাতীয়করণ করে । আফ্রিকী ভাষা সমূহকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত উচ্ছেদ করে এবং তদস্থলে ইংরেজি ভাষাকে বসিয়ে দেয়।

এটি এই নয় যে, ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা সমূহে হোচট খায়, যা কেনীয় ও আফ্রিকীদের মধ্যে কেনিয়া বিরোধী বা আফ্রিকা বিরোধী মনোভাব তৈরী করে। ওয়ালটার রুডনি তাঁর *How Europe Undeveloped*

Africa গ্রন্থে Alliance Francaise এর প্রতিষ্ঠাতা পীয়েরে ফঁসিনকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে "একটা শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক বন্ধনে উপনিবেশগুলোকে রাজধানী শহরের সাথে যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় – এমনকি সেই সময় যখন তাদের প্রগতিশীল স্বাধীনতার ব্যাপারটা সম্ভবতঃ মৈত্রী বা সমষ্টিতে এসে ঠেকে, তখনও তারা ভাবনায় ও স্পৃহায় ভাষার বিচারে ফরাসীই রয়ে গেল। "

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আফ্রিকী ভাষাগুলো যখন অস্পৃস্য হয়ে গেল তখন এই ভাষা-ভাষীরাও অপরাধীতে রূপান্তরিত হলো, যাদের খুঁজে খুঁজে বের করা হলো। সে বাচ্চারা স্কুলে আফ্রিকী ভাষায় কথা বলে তাদের পকেটে দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া পুরে দেওয়া হতো বহন করার জন্য, অথবা একটা প্ল্যাকার্ড বহন করতে হতো, যাতে লেখা থাকত "আমি একটা গর্দভ"। পশুপাখিকেও এভাবে পোষ মানানো হয়–অনাকাঙ্খিত আচরণকে বেদনার দ্বারা আর কাঙ্খিত আচরণকে আনন্দের দ্বারা দুরস্ত করা আর-কি । পরবর্তীতে এই পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য শিশুদের উপর বর্তায় স্বাভাবিক আচরণ হিসেবেই, যাতে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণে উচ্চাকাঙ্খায় আমাদের জিভ লালায় সিক্ত হয়। আর আফ্রিকী ভাষার শব্দসমুহ আমাদের মুখকে শুকিয়ে দেয় ঘৃনায়।

নজোনজো ও তার ইংরেজির উচ্চারণ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অথবা তার কাজ বিচ্ছিন্ন কোন উপযঙ্গ-ও নয়। সত্যটা হলো যে, আফ্রিকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের মধ্যেই একজন নজোনজো আছে । নজোনজোবাদ এখনও আফ্রিকার সমস্যা। ইউরোপ আফ্রিকাকে তার উচ্চারণের ঐর্শয্য দিয়েছে। আফ্রিকা ইউরোপকে তার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। একথা সত্য যে, তলোয়ার সাহায্য করেছে ইউরোপকে এই প্রবেশাধিকার অর্জন করতে। কিন্তু এই উচ্চারণ বিজয়ের স্মারক লাভ করে বিজিতের আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে।

গতবছর, বেশ সম্প্রতি একটা জিনিস দেখে আমার খুব ভালো লাগলো, আর তা হলো নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই কিছু জিনিস তৈরী করছে, যেমন, রয়েল সাতিমা মিনারেল ওয়াটার আর দই। আমি তাদের দই-ও খেয়েছি, পানি-ও খেয়েছি। দু'টোই কেনিয়ার তৈরী । ভালো লেগেছে। জার্মানী, যেখানে আমি আমার দশম সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী নিতে গিয়েছিলাম, সেখানে মই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা টিম আমাদের তাদের নিজেরদের তৈরী কাপড় উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিল। বিগত বছরগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে ভালো উপঢৌকন: কেনিয়ার তৈরী পোষাক থেকে তৈরী শার্ট। কি যে হতো যদি কেনীয় সরকার কেনিয়ার এই নব্য শিল্পের উপর আদেশ জারি করতো? কি যে হতো যদি নজোনজো বলতো, *আমাকে আর একটা উড়োজাহাজ বানিয়ে দাও*। এ-রকমই তো হওয়া উচিত। এর উত্তরটা ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে তৈরী ও হয়ে গেছে। বন্ধুগণ, নাইরোবী আর মই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের নিজেদের জিনিস নিজিদেরকেই তৈরী করতে দাও। শুধু কাপড়, দই আর বোতলজাত মিনারেল ওয়াটারে কেন থেমে গেছে? বাইসাইকেল কেন নয়? কেন নয় বৈদ্যতিক কার? কেন নয় উড়োজাহাজ? কেন নয় আমাদের প্রতিরক্ষার অস্ত্র? জাতির কোন চিরবন্ধু থাকে না, শুধু চিরস্বার্থ থাকে। নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য যার ওপর তুমি আজ নির্ভর করবে, হয়তো কাল সে-ই তোমাকে নিরস্ত্র করে ছাড়বে। প্রতিটি জাতির প্রথম অধিকারই হলো নিজেকে খাওয়ানো, পড়ানো, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও নিজেকে রক্ষা করা। কমপক্ষে এই সামর্থ্য গুলো তো থাকতেই হবে।

তাহলে চল সংগ্রাম করি মৌলিকত্ত্ব এবং চমৎকারিত্বের জন্য, তবে পরাধীনতা, অনুকরণ আর ভিক্ষা করার জন্য নয়। আমাদের সংস্কৃতি তো এটাই। আমাদের সংস্কৃতি হলো জানানো যে, আমরা কেনিয়া ও আফ্রিকাকে কী চোখে দেখি, লেখাপড়া ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে কী পছন্দ করি, পরিকল্পনা আর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমি কী ছাড়ি আর কী ধরি। এটিই আমাদের জীবন যাপনের উপায়, এটিই আমাদের জাতির চরিত্র, আমরা যারা কেনীয় তাদেও । তাহলে নাও আমরা পরাধীনতা, অনুকরণ ও ভিক্ষা- চর্চাকে নির্বাসনে পাঠাই।

একজন অনুকরণকারী সবসময়ই অনুসরনকারী। আর সে নিজের উপর বিশ্বাসহীনতার দ্বারা তাড়িত হয়, যার শুরুটা ভাষা দিয়েই । যদি তুমি দুনিয়ার সব ভাষাই জানো আর নিজের মাতৃভাষা না জানো বা তোমার সংস্কৃতিকে না জানো, তবেই সেটি দাসত্ব। তুমি যদি তোমার মাতৃভাষা জানো অথবা তোমার সংস্কৃতিকে না জানো, তবেই সেটি দাসত্ব। তুমি যদি তোমার মাতৃভাষা জানো, অথবা তোমার সংস্কৃতির ভাষা জানো, আর তার সাথে দুনিয়ার সব ভাষা যোগ কর, তবে সেটিই হলো ক্ষমতায়ন।

আমরা তাঁদের কাছ থেকে শিখব যারা স্বাধীন আফ্রিকী স্কুল চালিয়েছিল এবং গিথুংগারী টিচার্স কলেজ তৈরী করেছিল। তারা তাদের পকেটের টাকা জনগণের কল্যাণের জন্য দান করেছিল। আজ আমরা সবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ব্যক্তিগত কল্যাণে ব্যয় করি। তাদের কাছে নেতৃত্ব ছিল - জনগণের বিশ্বাস। আর আজ আমাদের কাছে রাজনীতি হলো - ব্যক্তিস্বার্থ। যদিও তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাকনাধীনে, তাঁরা কেনিয়াকে কেনীয় হিসেবে দেখেছেন এবং আস্ফালনকারী বহিরাগতদের কবল থেকে কেনিয়াকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। যখনই আমরা কেনিয়াকে বহিরাগতদের চোখ দিয়ে দেখি তখনই আমরা সেই দর্শনকে প্রতারিত করি যার জন্য কেনিয়ার সাধারণ নারী-পুরুষরা রক্ত দিয়েছে।

আমার উপন্যাস *Weep Not Child (কেঁদোনা বাছা*[i]) প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে আমি একদল অভিনেতাকে দেখলাম, যারা সেই ত্যাগের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। এটি বইটির একটা প্রধান বিষয়। তাদের শরীরী ভাষা দিয়ে যে চিত্রকল্প তৈরী করেছে তা ঐ সংগ্রামের বেদনা ও অহংকারকেই চিত্রায়ন করে। তারা প্রতিরোধের নন্দনতত্ত্বকে নাটকীয় রূপ দিয়েছে। তারা গান গেয়েছে: " আমাকে আমি হতে শেখাও। যদি তুমি আমাকে আমি হতে শেখাও তবে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে। যদি তুমি আমাকে আমি হতে শেখাও তবে আমি হবো মুক্ত। না-কি তুমি মুক্ত মানুষকে ভয় পাও? "

[i] উপন্যাসটি *কেঁদোনা বাছা* নামে অনুবাদ করেছেন শামীম মন্ডল